BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, V-15, N-24 (Jan to July 2020)

Copyright ©BIIT

ISSN 1816-689X

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে ঐতিহাসিক "বাইতুল হিকমাহ্"-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ আরিফুর রহমান*

সার সংক্ষেপ ঃ সভ্যতার বিকাশ সাধনে বাগদাদের ঐতিহাসিক বায়তুল হিকমাহ্-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পর বিশ্বে ঐশি জ্ঞানের যে আলোক ধারা উৎসারিত হয়েছিল, বাগদাদের ঐতিহাসিক বায়তুল হিকমাহ্র মাধ্যমে তা বহুমাত্রিকরূপে বিকশিত হয়। মহানবী (সা.)-এর সময়কার মদীনার মসজিদে নববীতে জ্ঞান চর্চার যে সূত্রপাত হয়েছিল, তারই পথ ধরে ঐতিহাসিক বায়তুল হিকমাহ্ জ্ঞান চর্চার এক উর্বর চারণ ভূমিতে পরিণত হয়। আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশিদ (শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯ খ্রি,) 'বাইতুল হিকমাহ্' (House of wisdom) প্রতিষ্ঠা করেন। তার সুযোগ্যপুত্র খলীফা আল মামুন (৮১৩- ৮৩৩ খ্রি.)- এর সময় এটি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। নবম শতকের মধ্যভাগে 'বাইতুল হিকমাহ' ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থভান্ডার। এ বিশাল গ্রন্থকেন্দ্র ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, অনুবাদকেন্দ্র, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মানমন্দির সে সময়ে বায়তুল হিকমাহায় চর্চিত জ্ঞানের আলোক শিখা এশিয়া আফ্রিকা এবং মুসলিম স্পেন হয়ে ইউরোপের মাটিকে আলোকিত করে। এ সময়ে বায়তুল হিকমায় বসেই কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, পন্ডিত চিত্রকর, দার্শনিক, ভূতত্ত্ববিদ, বণিক, পর্যটক প্রমুখ নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এটিকে ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে বাইতুল হিকমাহ্-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

মূল শব্দ : বায়তুল হিকমাহ, আব্বাসী যুগ, ইসলামী স্বর্ণ যুগ, গ্রন্থাগার, মানমন্দির।

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে আবাসী যুগকে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা হয়। নিঃসন্দেহে এ যুগ মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। আব্বাসী শাসকগণ এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল অংশ নিয়ে সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। এ সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের চরম উন্নতি সাধিত হয়। আব্বাসী খলীফা আল মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ নগরীকে নতুন রাজধানী হিসেবে

* **লেখক : উপগ্রন্থাগারিক, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।**

ঘোষণা দেন।[১] পরবর্তীতে এ বংশের অন্যান্য প্রভাবশালী খলীফাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় এক অত্যুজ্জল বাতিঘরের মর্যাদা লাভ করেছিল এ বাগদাদ। এ বাগদাদেই আব্বাসী খলীফারা 'বাইতুল হিকমা' (House of wisdom) নামে এক বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। এই 'বাইতুল হিকমা' ছিল সেই সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বৃহদাকার গ্রন্থাগার। এ বিশাল প্রতিষ্টানটি ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, অনুবাদকেন্দ্র, শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র এবং মানমন্দির। এখানে বসেই কবি সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, পন্ডিত, চিত্রকর, দার্শনিক, ভূতত্ত্ববিদ, বণিক, পর্যটক প্রমুখ নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। সমকালীন যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, যেমন সহল ইবনে হারুন, হুনাইন ইবনে ইসহাক, মুসা আল খারিজীমী প্রমুখ মনীষীগণ এ গ্রন্থাগারে বসে জ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। এ মহান গবেষণাগারের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযগ সৃষ্টি হয়েছিল। এই গবেষণাগারের মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা দীক্ষা কৃষ্ঠি ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন করে শুধু স্বর্ণ যুগেরই সূচনা করেননি, বরং অবলুপ্ত প্রাচীন মানবসভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে তারা বিশ্ব সভ্যতায় অপরিসীম অবদান রাখেন।

অগ্রযাত্রার ইতিহাস

শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আব্বাসীয় আমলে এক অদ্বিতীয় অধ্যায়। এ আমলে প্রকৃত অর্থে ইসলামি সভ্যতার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ ঘটে। তাদের অনুসন্ধিৎসা, বুদ্ধিরবৃত্তির প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ, জ্ঞান স্পৃহা প্রভৃতি কারনে তারা গড়ে তোলে এক অতুলনীয় বিজ্ঞানাগার। যা ইতিহাসে বায়তুল হিকমা নামে পরিচিত। আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশিদ (শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯) 'বাইতুল হিকমাহ্' প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্যই কারো কারো মতে তাঁর সুযোগ্যপুত্র খলীফা আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) এটি প্রতিষ্ঠা করেন।[২]-এর সময়এটি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে।[৩] নবম শতকের মধ্যভাগে 'বাইতুল হিকমাহ' ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থভান্ডার। এ বিশাল গ্রন্থকেন্দ্র ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, অনুবাদকেন্দ্র, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মানমন্দির। এটিকে ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪] বাইতুল হিকমাহ্ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ পি.কে. হিট্টি বলেন- The first prominent institution for higher learning of Islam was the Bayt at Hikmah (the house of wisdom) founded by al Mamun (830) in his capital. Besides serving as trnslation bureau this institution fuctioned as a academy and public library and had a observatory connected with it.[৫]

ব্যক্তিগতভাবে খলীফা আল মামুন ছিলেন বহু মানবিকগুণে গুণান্বিত একজন বিদগ্ধ শাসক।[৬] তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বায়তুল হিকমাহ্ জ্ঞান-গবেষণার এক অনন্য সাধরণ কেন্দ্রে পরিরণত হয়। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায় তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয় :

Al-Maʾmūn encouraged the translation of Greek philosophical and scientific works and founded an academy called the House of Wisdom (Bayt al-Ḥikmah) to which the translators, most often Christians, were attached. He also imported manuscripts of particularly important works that did not exist in the Islāmic countries from Byzantium. Developing an interest in the sciences as well, al-Maʾmūn established observatories at

which Muslim scholars could verify the astronomic knowledge handed down from antiquity.[৭]

জ্ঞানের আদান প্রদানের জন্য আল মামুন অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে বাইতুল হিকমাহতে নিয়ে আসেন। বায়তুল হিকমায় ফার্সী, গ্রীক, মিশরীয়, কালদীয়, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ সংগৃহীত হত। তাঁর উজির ইয়াহিয়া বার্মকী বিভিন্ন দেশের পন্ডিতদের বাগদাদে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আরবদের অগাষ্টাস খ্যাত এ বায়তুল হিকমাহ্ একাধারে গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাইব্রেরী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জৌলুশ্রাপ্রাপ্ত হয়।[৮] খলীফা আল মামুন বাগদাদের এ গ্রন্থাগারটিকে বৈশ্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাতে সেই যুগেই প্রায় ৭ মিলিন ডলার ব্যয় হয়েছিল। বীজ গণিতের জন্মদাতা মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খারেজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) সেই বিরাট গ্রন্থাগারের একজন লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। তিনি ভারত বিষয়ক একটি বই লিখেছিলেন- যার নাম কিতাবুল হিন্দ। গণিত শাস্ত্রে শূণ্যের মূল্য অপরিসীম। এই শূন্য [০] আবিষ্কার তার বলে দাবি করা হয়।[৯] হিসাব জাবর ওয়াল মোকাবেলা বইট তার বটির অবদানের একটি উত্তম নিদর্শন। এ সময়কালটিতে বায়তুল হিকমায় বিদেশী গ্রন্থের আবরী অনুবাদের ঝর্ণধারা প্রবাহিত হয়।[১০] খলীফা আল মামুন বিদেশী গ্রন্থ সংগ্রহ মাত্রাই তিনি ইহুদি, পার্সী, খৃস্টান, মুসলিম নির্বিশেষে পণ্ডিতদেরকে তার অনুবাদে নিযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্মে স্থপতি ও প্রকৌশলী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কাজ করতেন। তানা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সরকারি দিনপঞ্জির হিসাব রাখতেন এবং সরকারি কর্মী হিসেবেও কাজ করতেন। তারা একই সাথে চিকিৎসক ও পরামর্শদাতাও ছিলেন।[১১] খলীফা আল মামুনের কাছে সৌজন্যস্বরূপ আসতো জ্ঞানের অমূল্য সব সংগ্রহ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। তিনি সহল বিল হারুন নামক এক পার্সী ডাক্তারকে নিযুক্ত করলেন মুজুসী সভ্যতার মূল্যবান বই পুস্তকগুলো অনুবাদ করার জন্য। মামুনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে দরবারের সবার ভেতরই অনুরূপ প্রেরণা দেখা দিল। এ যুগে যেসব বই-পুস্তক অনূদিত হয়েছিল তা গ্রীক, ফার্সী, কালভী, কিবতী ও শামী ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল।[১২] এই লাইব্রেরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব অনুষদের পুস্তকসমূহ সংগ্রহ করা হয়। এখানে প্রায় ছয় লক্ষেরও বেশী পুস্তক সংগৃহীত হয়।

বায়তুল হিকমাহ্ 'খিজানাতুল হিকমাহ' নামেও পরিচিত ছিল।[১৩] এটি ছিল বাগদাদের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার মূল কেন্দ্র। এ গ্রন্থাগারের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল জ্যোর্তি বিজ্ঞান ও মানমন্দির।[১৪] এ গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকে ছাড়িয়ে যায়। এখানে বিজ্ঞানীর দিনরাত নিরলস গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং লেখার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। ভারত, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ তথা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সব প্রান্ত থেকেই জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটতো এ 'হাউজ অফ উইজডমে' জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে। এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী ও বিজ্ঞানীগণ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন: সহল ইবনে হারুন, হুনাইন ইবনে ইসহাক, মুসা আল খারিজীমী প্রমুখ।[১৫] বাইতুল হিকমাহ্-এর ভূমিকা সম্পর্কে পশ্চিমা লেখক ও সাংবাদিক জোনাথন লিয়েন্স তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন-

The classical works of Greek and other ancient philosopher and scientists might have been lost to the European it they had not been preserve in the Arabic language through of wisdom. Muslims translated them and also wrote comments and explanations and added their own ideas.[১৬]

বায়তুল হিকমাহ-এর কার্যক্রম

বায়তুল হিকমাহ ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। অনুবাদ কাজ ওজ্ঞান গবেষণার মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বায়তুল হিকমা গ্রন্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ ওই গ্রন্থাগারটিতে সংরক্ষিত ছিল। খলীফা হারুন ও তার উজির ইয়াহিয়া বার্মাকীর উদ্যোগে ফারসি, গ্রিক, মিসরীয়, ভারতীয়, ালদীয় প্রভৃতি ভাষার বই পুস্তক প্রাচীন পান্ডুলিপি প্রভৃতি এ গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ করেছিল। খলিফা হারুন-অর-রশিদের পর খলীফা খলিফা মামুনও পিতার মতো বাযতুল হিকমার উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহন করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বায়তুল হিকমার পরিসর বৃদ্ধি পায়। ওই সময় গ্যালেন, হিপোক্রেটিস, ডায়োস-কোরইডিসের রচনাবলি, প্লেটোর রিপাবলিক এবং এরিস্টটলের ক্যাটেগরিজ, ফিজিঙ ও ,ম্যাড়না মরালিয়াসহ প্রভৃতি গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়।[১৭] আল মামুনের খেলাফতকালে শুধু গ্রিক রচনাবলি অনুবাদ করতেই বায়তুল হিকমা থেকে প্রায় তিন লাখ দিনার ব্যয় করা হয়েছিল বলে জানা যায়। ওই সময়ে ইসলামের আগের যুগের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ, প্রাচীন আরবের কসিদা ও কবিতা, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, সন্ধিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষের উদ্যোগ নেয়া হয়। সার্বিক বিবেচনায় খলীফা মামুনের রাজত্বকাল ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জল ও গৌরবময় যুগ।

এ গৌরবোজ্জল অধ্যায় সৃষ্টির মূলে ছিলো বায়তুল হিকমার অবদান। মুসলিম জাহানের খলীফা বায়তুল হিকমায় গবেষনারত, পারসিক, হিন্দু, গ্রীক, খৃষ্টান, আরবীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মনীষীদের মাধ্যমে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও বৈদেশিক রাজ্য হতে নানা দেশের জ্ঞান ভান্ডারে সঞ্চিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আহরন করেন। খলীফা আল মামুনের শাসনামলে বায়তুল হিকমাহর সাথেই মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮] ওই মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হতো। খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ ইয়াহিয়া ওই মানমন্দিরে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠান গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, আলকেমি, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল ও মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চার অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান হয়ে উঠে। ভারতীয়, গ্রীক ও পারসিয়ান রচনা ব্যবহার করে পণ্ডিতরা বৈশ্বিক জ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার অর্জন করেন এবং এর মাধ্যমে তাদের নিজেদের আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে যান। নবম শতকের মধ্যভাগে বাইতুল হিকমাহ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থভান্ডার।[১৯] বায়তুল হিকমা গ্রন্থগারের গ্রন্থারিকের মধ্যে সাহল ইবন হারুন, সাঈদ ইবন হারুন এবং সালাম অন্যতম ছিলেন। ওই তিনজন গ্রন্থগারিককে সাহিব উপাধি প্রদান করা হয়। বীজগণিতের জন মুহাম্মদ ইবন মুসা আল খারেজমিও (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেন।[২০]

গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও প্রতিলিপি তৈরি, গ্রন্থপঞ্জী তৈরি, অধ্যয়ন ও গ্রন্থ ধার দেয়া প্রভৃতি ছিল গ্রন্থাগারের নিয়মিত কার্যক্রম। বায়তুল হিকমায়ও এসব কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এ গ্রন্থাগারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। মুসলিম স্বর্ণযুগে যেসব মৌলিক গবেষণা ও আবিস্কারের কথা আমরা জানতে তার সিংহভাগই এ গ্রন্থাগারে বসে গবেষকরা আবিস্কার করেছেন। সে যুগে আজকের দিনের মতো আনুষ্ঠানিক কোনো গবেষণাগার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। বায়তুল হিকমাহ ও অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলোই ছিল উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। আল খারেজামীর বীজ গণিত আবিস্কার, ইবনে খলদুনের

সমাজ বিজ্ঞান রচনা, আল কিন্দির রসায়ণ চর্চা, আল বেরুনীর পদার্থ বিজ্ঞান রচনা, ইবনে সিনার চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচন প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনার মূল কেন্দ্রস্থল ছিল এ গ্রন্থাগার।

বাগদাদের বায়তুল হিকমায় বিশ্বের নানা প্রান্তের মুসলিম-অমুসলিম পণ্ডিতেরা এসে জড়ো হতেন। একদিকে তারা যেমন জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করতেন, তেমনি প্রাচীন বিভিন্ন শাখার জ্ঞানকে অনুবাদের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতেন। সভ্যতার বিকাশ সাধনে তাদের এ অনুবাদ কার্যক্রমটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুবাদকর্মে নিয়োজিত পণ্ডিতদের অন্তহীন সাধনায় প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবীতে অনূদিত হয়। এর ফলে বিশ্বমানবতা অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছে। প্রাচীন মসোপটেমিয়া, রোম, চীন, ভারত, গ্রীস, মিশর, পারস্য, উত্তর আফ্রিকা, বাইজান্টইন প্রভৃতি সভ্যতার জ্ঞান নিয়ে চর্চা হতো সেখানে। এ জ্ঞানসম্ভার প্রথমে আরবীতে অনূদিত হলেও কালক্রমে তুর্কী, সিন্ধী, ল্যাটিন, ফার্সি, হিব্রু, ইংরেজী ইত্যাদি নানা ভাষায় ভাষান্তর হয়ে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডাকে সমৃদ্ধ করে। আজকের উন্নত বিশ্ব আরবদের হাত ধরে এভাবে প্রাচীন জ্ঞানের অধিকারী হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে গবেষক সরদার ও ডেভিটের একটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তারা বলছেন-`Under the conditions of intellectual culture which characterised Moslem and Christian society even a greater inequality prevailed. The library of Mostandir, Sultan of Egypt, contained eighty thousand volumes; that of the Fatimids of Cairo, a million; that of Tripoli, two hundred thousand; in the thirteenth century, when Bagdad was sacked by the Mongols, the books cast into the Tigris completely covered its surface, and their ink dyed its waters black, while a far greater number were destroyed by fire; the public collections of the Moorish Khalifate of Spain were seventy in number … The collections of many private individuals were proportionately large. In that of Ibn-al-Mathran, the physician of Saladin, were ten thousand manuscripts; upon the shelves of Dunasch-ben-Tamin, the great Jewish surgeon of Cairo, were more than twenty thousand. Four centuries afterwards few books existed in Christian Europe excepting those preserved in monasteries; the royal library of France consisted of nine hundred volumes, two-thirds of which were theological works; their subjects were limited to pious homilies, the miracles of saints, the duties of obedience to ecclesiastical superiors.'[২১]

বায়তুল হিকমাহর অবদান

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সাড়া জাগানো ও প্রভাবশালী জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র বায়তুল হিকমাহ একটি গ্রন্থাগার হিসেবের যাত্রা শুরু করলেও ক্রমেই তা উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্র, অনুবাদকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মানমন্দিরে পরিণত হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশে এ মহৎ প্রতিষ্ঠানটি যেসব মৌলিক আবদান রেখেছে তা নিম্নরূপ :

১. **শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা:** মধ্যযুগের গ্রন্থাগারসমূহে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মুসলিম নৃপতিগণ কুরআনের নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার প্রচার-প্রসারকে ব্রতী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় প্রত্যেক মুসলিম শাসকই শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে আব্বাসী খলিফা মামুন শিক্ষাকে দেশ জয়ের থেকে

বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। শিক্ষা ও সাংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি বায়তুল হিকমাহকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেন। এ ছাড়াও তিনি সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

২. **লিখন শিল্পের প্রয়োজনে কাজগর উৎপাদনে ভূমিকা পালনঃ** বায়তুল হিকমাহর অগ্রসরমান ভূমিকার ফলে লিখণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ অবস্থান শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের জন্য এবং বায়তুল হিকমার কার্যক্রমকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য খলীফা আল মামুন কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করেন। কার্যাবলীকে নির্বিঘ্ন করার জন্য মামুন চীনাদের অনুকরণের কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় প্রচুর কাগজ উৎপাদনের ফলেই শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

৩. **বিদেশী গ্রন্থাবলীর অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানের সম্প্রসারণঃ** মধ্যযুগের গ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে অনুবাদ কার্য ছিল অবধারিত। বায়তুল হিকমায় বসে পণ্ডিতরা বিদেশী বইয়ের অনুবাদ করতেন। এ অনুবাদ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাচীন জ্ঞানের সন্নিবেশে জ্ঞানের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়।

রাষ্টীয় পৃষ্ঠপোষকাতায় এসময়ে অনুবাদ কর্মের বিশাল এক মহাআয়োজন চলছিল বায়তুল হিকমাহ্‌সহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে। বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানকে ধীরে ধীরে আরবি ভাষায় রূপান্তর এবং কালক্রমে অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরের কথা তো শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের সময় মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিম পণ্ডিত ও বিদ্ধান ব্যাক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। খলীফা হারুন উর রশিদের প্রধান উজির ইয়াহইয়া বার্মেকী ছিলেন তাদের অন্যতম। অন্যান্য খ্যাতিমান পণ্ডিতজনের মধ্যে রয়েছেন এরিস্টটলের রচনাবলীর অনুবাদকারী আল কিন্দি এবং হিপোক্রিটাসের অনুবাদক হুনাইন ইবনে ইসহাক। হুনাইন ইবনে ইসহাককে বলা হতো অনুবাদকদের শেখ বা প্রধান অনুবাদক।[২২] বাইতুল হিকমার অভ্যন্তরে, আরবী, ফারসী, আরামাইক, হিব্রু, সিরিয়াক, গ্রীক ও ল্যাটিন সহ বিভিন্ন ভাসায় জ্ঞানচর্চা করা হত। বিভিন্ন ভাষঅর রচনাসমূহ আরবীতে অনুবাদের জন্য দক্ষ অনুবাদকের নিয়োগ দেওয়া হত। ইউহান্না বিন আল-বুতরাক আল-তরজুমান ছিলেন বাউতুল হিকমাহর একনজন বিখ্যাত অনুবাদক।[২৩] খলীফা মামুন অনুবাদকের উৎসাহিত করার জন্য তাদের অনুবাদকর্মের সমান ওজনের স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতেন। অনুবাদ বিষয়ক আরো আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

অনুবাদ কার্যের ক্ষেত্রেও বায়তুল হিকমাহর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। খলীফা আল মামুনের দরবারের উজ্জল রত্ন লব্ধ প্রতিষ্ঠা অনুবাদক হুনাইন ইবনে ইসহাক। (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.) ছিলেন বায়তুল হিকমার মহাপরিচালক।[২৪] তাঁকে অনুবাদকদের শেখ বলা হতো। তাঁর নেতৃত্বে এখানে অনুবাদ কার্যাবলী চলত বিরামহীনভাবে। তিনি নিজে গ্রীক ভাষায় শিক্ষা লাভ করে গ্রীক অঞ্চল হতে পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত হন এবং এসব আরবিতে অনুবাদন করেন। এছাড়া বায়তুল হিকমার অন্যান্য অনুবাদকগণ Galen, Pual, Euclid, Ptolemy প্রমূখ মনীষীরা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি এবং বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল এবং প্লেটোর মূল্যবান গ্রন্থাদি আরবি ভাষা অনুবাদ করেন। এ সময় লিউকের পুত্র কোস্টার এর মাধ্যমে গ্রীক সিরিয়া ও ক্যালডিয়

ভাষার গ্রন্থাদি, মানকাহ এবং দাবান নামক ব্রাহ্মন মনীষীদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গণিত ও জ্যাতির্বিদ্যার গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ করা হয়।

৪. **স্বতন্ত্র বিভিন্ন শাস্ত্রের বিকাশ লাভ :** ইসলামী স্বর্ণ যুগের এ সময়ে গ্রন্থাগারের সুবাদে বিভিন্ন বিষয় বিন্যস্ত আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। ইতিহাস ভুগোল, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অভিধান, সাহিত্য ও ব্যাকরণ ইত্যাদি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হলো যা ইতিপূর্বে অনুপস্থিত ছিল। এ প্রসঙ্গে মিশরীয় লেখন ও চিন্তাবিদ ড. আহমদ আমীন লেখন-

আব্বাসী যুগের আবির্ভাব থেকে আমরা জ্ঞান চর্চার ভিন্ন অভিপ্রকাশ দেখতে পেলাম। মুসলিম জাহানের সর্বত্র জাগতিক শাস্ত্র চর্চার অভূতপূর্ব জোয়ার এলো। দর্শন যুক্তিবিদ্যা থেকে শুরু করে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা পর্যন্ত সকল গ্রীক শাস্ত্র এবং ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা আরবীতে অনূদিত হলো। পারসিক গ্রীক রোমক ও অন্যান্য জাতির ইতিহাসও অনুবাদের আওতায় চলে এলো।[২৫]

তিনি আরো বলেন - আব্বাসী যুগে এসে জ্ঞান ও শাস্ত্র পৃথক পৃথক সত্তা লাভ করলো এবং প্রতিটি শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হলো, এমন এমনকি একই শাস্ত্রের সদৃশ বিষয়গুলো এক অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।[২৬]

বহুমুখী কার্যক্রমের চারণভূমি বায়তুল হিকমাহকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের এসব মহাআয়োজন পরিচালিত হয়। খালিদ বিন আব্দুল মালিক, ইয়াহইয়া বিন আল মানসূর, সিন্দবিন আলী প্রমূখ গনিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগন বায়তুল হিকমার উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। তারা মানুষের স্থাপিত মানমন্দিরে গবেষণা করে তৎকালে পৃথিবীর আকৃতি, গ্রহ, বিষুব রেখা, ধূমকেতু, উল্কাপিন্ড প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। বায়তুল হিকমা চিকিৎসার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এখানকার গবেষক উহান্না বিন মূসাওয়াহ নামক চিকিৎসা বিজ্ঞানী রসায়ন শাস্ত্রের উপর জারির ভস্মীকরন ও লঘুকরন ও লঘুকরন সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন। যুগ শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও ভূগলবিদ মুহাম্মদ বিন মূসা আল খাওয়ারিজমী বায়তুল হিকমার একজন মৌলিক গনিত গবেষক ছিলেন। গণিত শাস্ত্রের উপর রচিত কিতাবুল জাবর ওয়াল মুকাবালা গ্রন্থটি তার অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থটি ষোড়শ শতাব্দির পূর্য পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে টেক্সট বই হিসেবে পড়ানো হতো এ সময়ে ইতিহাস, সাহিত্য, ভুগোলবিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে। এ বিষয়ের পরিসমাপ্তিতে ড. আহমদ আমীন বলেন-

"অন্যদিকে আলিমগণ দর্শন, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রন্থের অনুবাদ ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। সুতরাং সে যুগে ছিল না এমন কোন শাস্ত্রের কথা আর বলা যায়? পরবর্তীতে যা হয়েছে, তা তো শুধু বৃদ্ধি ও পুষ্টি এবং শাস্ত্রীর গ্রন্থ রচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এবং কল্যাণকর বা ক্ষতিকর ব্যাখ্যা পর্যালোচনার সংযোজন।"[২৭]

৫. **মৌলিক গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন:** বায়তুল হিকমার গবেষকগণ উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিস্বরণীয় অবদান রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় অনুভূতির পরিবর্তে বিচার বুদ্ধি, যুক্তিতর্ক, প্রগাঢ়, অনুশীলনী দ্বারা মুসলমানগন জ্ঞানের বিভিন্ন

শাখায় অবদান রাখতে সক্ষম হন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই সাফল্য বিজ্ঞান বা সাহিত্যের কোন বিশেষ শাখায় সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি বুদ্ধিবৃত্তির যাবতীয় শাখঅয় প্রসার লাভ করেছিল।

৬. **ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ :** বায়তুল হিকমা জ্ঞান বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল এর ফলে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ সূচনা হয়েছিল। ঐতিহাসিক মুইর বলেন, এই সমস্ত মনীষীদের পরিশ্রমের ফলে মধ্য যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় জাতিগুলোর সাথে তাদের অথচ বিস্তৃত পৈত্রিক সম্পদ গ্রীসর বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে পুনর্মিলন ঘটে। অনেক ঐতিহাসিক একে The golden age of Islamic civilization বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে একে Augustan age বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[২৮]

মিসরীয় লেখক ও চিন্তাবিদ ড. আহমদ আমীন এ প্রসঙ্গে লিখেন- 'মোট কথা উমাইয়া শাসনের শেষদিক থেকে শুরু করে আব্বাসীয় সালতানাতের প্রথমদিক পর্যন্ত মোট পঞ্চাশ বছরের কম সময়ের মধ্যে অধিকাংশ জ্ঞান ও শাস্ত্র বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হোক তা বাণীনির্ভর জ্ঞান তথা তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসুলুল ফিকাহ, কিংবা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক জ্ঞান কিংবা বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান, তথা গণিত, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন কালাম ইত্যাদি। মুসলিম জাতির এ বুদ্ধিভিত্তিক উদ্দীপনা ও কর্মযজ্ঞ অন্যান্য জাতির অবাক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।'[২৯]

মূলত এ যুগটি ছিল জ্ঞান–বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ। বিশেষ করে আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন (মৃ. ৮৩৩ খ্রি.) -এর সময়কালে (৮১৩ - ৮৩৩ খ্রি.) জ্ঞান–বিজ্ঞানের আকাশচুম্বী ও বিস্ময়কর উন্নতি হয়। তিনি নিজেও ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তাঁর সকাশে সন্নিবেশিত হয়েছিল আরো হাজারো পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিবর্গ।[৩০] তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তা ও পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছিল জ্ঞান সৃষ্টি, চর্চাও বিকাশের এক বিরাট ইনিষ্টিটিউট বা গবেষণাগার। ইতিহাস বিখ্যাত গ্রন্থাগার 'বায়তুল হিকমাহ' তৈরি হয়েছিল এ যুগে। যে বায়তুল হিকমাহ্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল।

মৌলিক আবিস্কার :

ঐতিহাসিক বায়তুল হিকমায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের ফলে সে যুগে জ্ঞানের অসংখ্য মৌলিক শাখা আবিস্কার হয়েছিল। এর ক্ষেত্র ছিল অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বিষয়ের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

রসায়ন শাস্ত্র

মধ্যযুগে রসায়ন শাস্ত্রের আবিস্কার ও বিকাশে মুসলমান স্কলারদের বিরাট অবদান রয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাত ধরে এ শাস্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে যাদের অবদান অবিস্মরণীয় তাদের কয়েকজন হলেন: জাফর আল-সাদিক (৭০২-৭৬৫ খ্রি.) জাবির ইবন হাইয়্যান (৭২১-৮১৫ খ্রি.), আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.), আল বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.), আল-মাজ্রিতী (১০০৭-১০০৮ খ্রি.), আব্বাসর ইবন ফিরনাস, মুহাম্মদ ইবন জাকারিয়া প্রমুখ। মুহাম্মদ ইবন জাকারিয়া একজন শ্রেষ্ঠ রসায়ন শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। তিনি হীরাকষকে শোধন করে গন্ধব-দ্রাবক তুঁতিয়া প্রস্তুত করেছিলেন।[৩১] রসায়ন শাস্ত্রে জাবির ইবন হাইয়্যানের অবদান ছিল সর্বাধিক। ধাতু সম্পর্কে তাঁর মতামত আঠার শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় শিক্ষাধারায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩২] ঐতিহাসিক ইবন নাদিমের মতে তিনি দুই হাজারের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জাবির ইবন হাইয়্যান সম্পর্কে দার্শনিক ব্যকন বলেন-

Jaber ibne hyan is the first to teach the science chemistry to the world, he is the father of chemistry.[৩৩]

পদার্থ বিজ্ঞান

পদার্থ বিদ্যায়ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান অপরিসীম। বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ইবন সিনা তার শিফা ও নাজাত গ্রন্থে দার্শনিক আলোচনার পাশাপাশি পদার্থ বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, আবহবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণামুলক আলোচনা করেছেন। আল কিন্দী, তার রচনার সংখ্যা কমপক্ষে ২৬৫ টি এবং তিনি আরবদের মধ্যে মধ্যে প্রথম মুসলিম দার্শনিক।[৩৪] সুনির্দিষ্ট ওজন, জোয়ার ভাটা, আলোক-বিজ্ঞান এবং বিশেষত আলোর প্রতিফলন সম্পর্কে তার একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। আল কিন্দী অস্ত্রের লৌহ ও ইস্পাত এর জন্য ছোট ছোট বই লেখেন। পদার্থ বিজ্ঞানে আল বিরূনীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পদার্থ বিজ্ঞানে তার বৃহত্তম অবদান হচ্ছে, প্রায় সঠিক ভাবে আঠারটি মূল্য পাথর ও ধাতুর সুনির্দিষ্ট ওজন নিরূপন। পদার্থ বিদ্যায় যার নাম না স্মরণ করলেই নয় তিনি হচ্ছেন একাধম শতাব্দীর হাসান ইবন হায়সাম। যিনি একাধারে পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ, অংকবিদ ও চিকিৎসক অন্যান্য প্রসিদ্ধ মুসলিম পর্দথবিদরা হলেন: জাফর ইবন সাদিক, আব্বাস আবন ফিরনাস, আল-সাঘানি ইবন ইউনুস, আল-কিন্দী, আল-কারাজি, আল-হাইথাম, আল-বিরুনী, ইবন বাজ্জাহ, ইবন রুশ্‌দ প্রমুখ। পদার্থ বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তামহিদুল মুসতাকাররে লিমানিল মামারবে, কিতাবুল মানয়িব, রিসালাতু ফিশাশফক, প্রভৃতি।

গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্র

স্বর্ণযুগে মুসলিমরা যেসব বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন, গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্র তাদের অন্যতম। এ শাস্ত্রের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মনীষী হচ্ছেন: মুহাম্মদ ইবন মুসা আল-খারিজ্‌মি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.), ওমর খৈয়াম (মৃ. ১১৩১ খ্রি.), শরীফ আল-দীন আল-তুসি, আবুল হাসান ইবন আলী আল কালাসাদী (১৪১২-১৪৮২ খ্রি.) আল-কারাজি, আবু মাহমুদ খোজান্দি, তাহিত ইবন কুররাসহ আরো অনেকে।

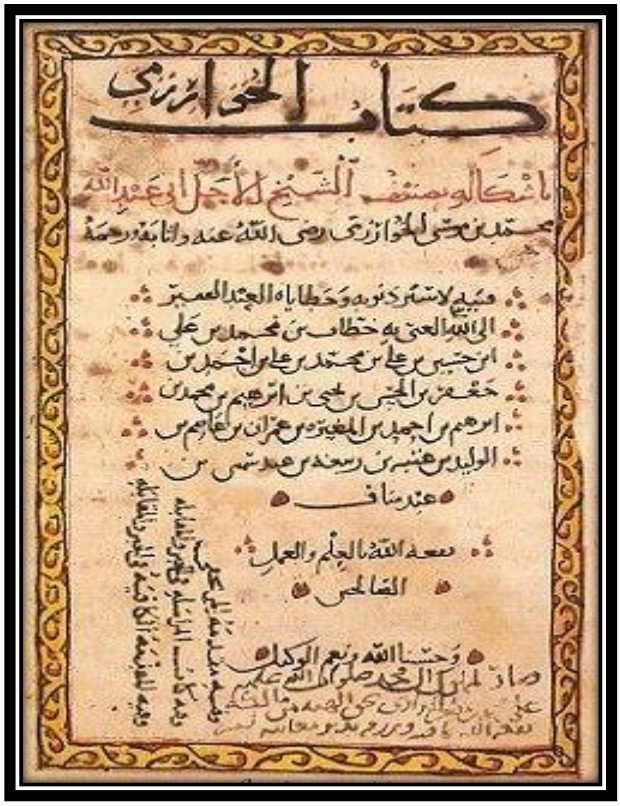

(আল খারেজমির কিতাবুল জাবর ওয়াল মুকাবিলার একটি পাঠ্য চিত্র)[৩৫]

গণিতের যার নাম সর্বাদিক প্রসিদ্ধ তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবন মুসা আল খারিজমি। তার সম্পর্কে একজন পশ্চিমা মনীষীর মতামত হচ্ছে-

The greatest mathematician of the time, and if one takes all circumstances into account, one of the greatest of all time was Al Khwarizmi.[৩৬]

অপরদিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়ন ও বিকাশে মুসলিম পণ্ডিতগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। এ শাস্ত্রে মুহাম্মদ ইবন জাকারিয়া হাম ও বসন্ত রোগের ওপর 'আল জুদারী ওয়াল হাসবাহ' নামক বই লিখে অমর হয়ে আছেন। তার বইটি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল মুসলিম মনীষীদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের স্বর্ণযুগ। এ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি অবাদন রাখে আবু আলী আল হুসাইন ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম এ চিকিৎসাবিজ্ঞানী পুরো বিশ্বে চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক বলে সুপরিচিত। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সেরা চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক অবদান রাখার ক্ষেত্রে তার অবদান সবার উর্ধ্বে। তার চিকিৎসা বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল কানুন ফিত তিব' চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত। ১০ লক্ষ শব্দ সম্বলিত এ গ্রন্থটি চিকিৎসা বিষয়ক যাবতীয় তথ্যের এক বিস্ময়কর রচনা। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল উৎসসূত্র হিসেবে এ গ্রন্থটিকে বিবেচনা

করা হয়। এটি ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে মেডিকেল কলেজগুলোর পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রফেসর সার্টন ইবন সিনা সম্পর্কে বলেন-

One of the most famous exponents of Muslim universalism and an eminent figure in Islamic learning was Ibn Sina, known in the West as Avicenna. For a thousand years he has retained his original renown as one of the greatest thinkers and medical scholars in history. His most important medical works are the Qanun (Canon) and the Treatise of Cardiac drugs. `The Qanunan fi al Tib' is an immense encyclopedia of Medicine.[৩৭]

ইবনে সিনা ছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণায় অভাবনীয় অবদান রাখেন প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম মনীষী। তাঁদের মধ্যে হাসান ইবনে হাইসাম (৯৬৫-১০৪০ খ্রি.) আলবেরুনি (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.) ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.), আলী ইবনে রাব্বান, হুনাইন ইবনে ইসহাক (চক্ষু বিশেষজ্ঞ), আবুল কাসেম জাহরাবি মেডিসিন ও সার্জারি বিশেষজ্ঞ), জুহান্না বিন মাসওয়াই (চক্ষুশাস্ত্রের ওপর প্রামণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন), সিনান বিন সাবিত, সাবিত ইবনে কুরা, কুস্তা বিন লুকা, জাবির ইবনে হাইয়ান, আলী আত তাবারি, আর-রাজি, আলী ইবনে আব্বাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস, দর্শন, ভুগোল ও জীবনীসাহিত্য

ইসলামের সোনালী যুগের প্রারম্ভে উমাইয়া আমলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় ইতিহাস শাস্ত্রেরও ক্রমযাত্রা শুরু হয়।[৩৮] ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি লিখেন- Arabic Histography, which also began at this time (Ummayyad period), started in the form of tradition (Hadith). It was therefore one of the earliest disciplines cultivated by the Arab Moslems. (আরবী ইতিহাস রচনাও এ সময়ে [উমাইয়া যুগে] শুরু হয়। তা প্রথম দিকে হাদীস সংকলনরূপে লেখা হয়। ইহা আরব মুসলমানদের দ্বারা রচিত জ্ঞানের এক প্রাচীনধারা।)[৩৯]

(১২ শতকে আল ইদ্রিসি কর্তৃক আবিস্কৃত পৃথিবীর মানচিত্র)[৪০]

দক্ষিণ আরবের অধিবাসী বিখ্যাত গল্পকার আবিদ ইবন শারিয়া হজরত আমিরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর দরবাবে গিয়ে প্রাচীন রাজন্যবর্গের ইতিহাস শুনিয়েছিলেন। আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) এর অনুপ্রেরণায় তিনি এ সম্পর্কিত কিতাবুলমূলক ও *ওয়াল আখবার আল মাদইন* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা ঐতিহাসিক মাসুদীর (মৃ. ৯৬৫ খ্রি.) সময়কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সূচনাকালে সিয়ার ও মাগাযীর বিষয়সমূহের সমন্বয়ে ইতিহাসের যাত্রা শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে তা এক বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়। রূপকথা, হাদীস, জীবনী, বংশ-বৃত্তান্ত এবং প্রাক যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ইত্যাদিকে বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ইতিহাস চর্চা শুরু হলেও কালপরিক্রমায় তা পৃথিবীর আদি থেকে শুরু করে অতীত বর্তমানের সব ঘটনার সমন্বয়ে এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পরিণত হয়। আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে নামটি সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষ করা যায়, তা হল ইবন মুকাফ্ফা (মৃ.৭৭৫ খ্রি.) তিনি *সীয়ার আল মূলক ওয়াল আজম* (রাজা বাদশাদের কাহিনী) গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ সময়ের আরেকজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবন সা'দ (মৃ. ২০৩ হি.) যিনি *তাবাকাত আল কুবরা* নামে এক বিশাল ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। এর পরে হচ্ছেন ইবন কুতাইবা (মৃ. ৮৯৫ খ্রি.) যাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইবন মুসলিম আল-দিনওয়ারী। তাঁর লিখিত বইকে ইতিহাসের জ্ঞানকোষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আবু বকর মুহাম্মদ ইবন যাকারিয়া আল রাযী (মৃ.৯২৫ খ্রি.) দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১৮৪টির মতো বই লিখেছিলেন।[৪১]

উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকজন মুসলিম ইতিহাসবিদ হচ্ছেন: মুহাম্মদ ইবন ওমর আল ওয়াকেদী (মৃ. ৮২২ খ্রি.), ইবন আব্দ আল হাকীম (মৃ. ৮৭০ খ্রি.), আহমদ ইবন ইয়াহিয়া আল বালাযুরী (মৃ. ৮৯২ খ্রি.), ইবন ওয়াজিত আল ইয়াকুবী (মৃ. ৮৭২ খ্রি.), আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আল তাবারী (মৃ. ৯২৩ খ্রি.), আবুল হাসান আলী আল মাসুদী (মৃ. ৯৫৭ খৃ), ইবনুল আসীর (মৃ. ১২৩৪ খ্রি.), আয-যাহাবী (মৃ. ১৩৩৮ খ্রি.) হাফিজ ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইবন কাছির (মৃ. ১৩৩১ খ্রি.) এবং ইবন খালদূন (জ. ১৩৩২ খ্রি.) প্রমুখ।

সমাজবিজ্ঞান, রাষ্টবিজ্ঞান ও অর্থনীতি

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আবিস্কার ও এর বিকাশে মধ্যযুগের মুসলিম মনীষীরা যে অবদান রেখেছিলেন তা ছিল রীতিমত বিস্ময়কর ও প্রবাদতুল্য। এ ধারাবাহিকতায় সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্টবিজ্ঞান, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তারা অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। ইসলামী স্বর্ণযুগে এসব বিষয়ে অসমান্য অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হচ্ছেন- সমাজ বিজ্ঞানী ইবন খালদুন ইবনে খালদুন (১৩৩২- ১৪০৬ খ্রি.), অর্থনীতিবিদ ইবন নাফিজ (১২১৩- ১২৮৮ খ্রি.), দার্শকি ও সমাজ বিজ্ঞানী মুহাম্মদ আল-গাজালি (১০৫৮-১১১১ খ্রি.), রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল মাওয়ার্দী (জ. ৯৭২ খ্রি.) ইসলামী ফিকাহবিদ, ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩ - ১৩২৮ খ্রি.), প্রমুখ। ইবন খলদুন সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের জনক হিসেবে পরিচিত। তিনি ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। তার বিখ্যাত রচনা 'কিতাবুল ইবর ওয়াদিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ওয়া আইয়্যামুল আরব' নামক গ্রন্থটির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে অছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকা অংশটি আল মুকাদ্দিমা নামে সারা বিশ্বে পরিচিত। এ গ্রন্থে তিনি সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের শোভামণ্ডিত যে রূপ তুলে ধরেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। ইসলামী সভ্যতায় রাষ্টবিজ্ঞানের ওপর অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন আবুল হাসান আল

মাওয়ার্দী । আল মাওয়ারদির রচিত 'আহকামুস সুলতানিয়া' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রনীতির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়াও তাফসীর, হাদীস ফিকাহসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচিত তার অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে।

মানমন্দির ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

মানমিন্দর বা, Observatory হচ্ছে পৃথিবী ও মহাশূণ্য এবং পরিমাপ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে তৈরিযন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ গবেষণাগার। জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, জলবায়ুবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণার জন্যই সাধারণত মানমিন্দর স্থাপন করা হয়ে থাকে। অভিধানের ভাষায় :

An observatory is a building with a large telescope from which scientists study things such as the planets by watching them.[৪২]

মহাকাশের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত। সূর্য-চাঁদ এবং গ্রহনক্ষত্রের গতিপ্রাকৃতি ও আকৃতি নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই কারও। সেই প্রাচীনকাল থেকেই এই কৌতূহল মেটাতে নানা তৎপরতা চলছে। আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য লোকালয় থেকে দূরে উঁচু পাহাড়া বা খোলা প্রান্তরে অবকাঠামো গড়ে তোলার রেওয়াজও শুরু হয়েছে বহু আগেই। এসব অবকাঠামো 'মানমন্দির' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক বায়তুল হিকমাহর সাথেই গড়ে উঠেছিল পৃথিবার প্রথম মানমন্দির। খলিফা আল মামুনই প্রথম মানমন্দির তৈরি করেন।[৪৩] এই মানমন্দিরের আবিষ্কারক ছিলেন- হাজ্জাজ ইবনে মাসার এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক, যারা বায়তুল হিকমাহ্‌র অন্যতম গবেষক ছিলেন। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৪]

ইসলামী সভ্যতার যৌবনকালে মুসলিম পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধরণ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রাচীন সভ্যতার টলেমীর বিখ্যাত মানমন্দির আলমাগেস্টের অবলম্বনে জ্যোতিবির্দা চর্চা করেন। ভারতের সিন্ধু থেকে পণ্ডিত "কানাক" বায়তুল হিকমায় "সুরিয়া সিদ্ধান্ত" সহ ৫টি বই নিয়ে আসেন। এর মধ্যে ছিল ভারতের ঋষিদের লেখা প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই। খলিফা মনসুর সেই বইয়ের কিছু অংশ শুনে এতইমুদ্ধ হলেন যে, ফাজারিকে আদেশ দিলেন পণ্ডিতকে রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তায় রেখে বইগুলোর অনুবাদ শুরু করতে। নাম দেয়া হল "সিন্ধ হিন্দ"। এখান থেকেই বইটি প্রথম গেছে স্পেনে। স্পেন থেকে ছড়িয়ে গেছে পুরো ইউরোপে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিজ্ঞানী অসীম অবদান রেখেছিরেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: আল বাত্তানী (৮৫৮-৯২৯ খ্রি.), আল ফারাবী (৮৭২-৯৫০ খ্রি.) আবু মাশর আল-বালখী (৭৮৭-৮৮৬ খ্রি.) আল-খারিজ্‌মি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) আল-ফারঘানী (৮০৫-৮৭৫ খ্রি.), দিনাওয়ারী (৮১৫-৮৯৬ খ্রি.) সিন্দ ইবন আলী, আলী কুশজি, ইবরাহিম আল-ফাজারি, নাসির আল-দীন আল-তুসি প্রমুখ।

হাদীস ও ফিকাহ সংকলন

ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে হাদীস সংকলন ও ফিকাহ চর্চার এক মহাকর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এ সময়কালে প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। এ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে :

(১) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারীর (১৯৪-২৫৬ হি.) সংকলিত *সহীহুল বুখারী*।

(২) আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আন নিশাপুরীর (২০৪-২৬১ হি.) সংকলিত *সহীহুল মুসলিম*।

(৩) আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুয়াইব ইবন আলী ইবন দীনার আন নাসায়ীর (২১৫-৩০৩ হি.) সংকলিত *সুনান আন নাসায়ী*।

(৪) আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশআস ইবন ইসহাক আস সিজিস্তানীর (২০২-২৭৫ হি.) সংকলিত *সুনান আবু দাউদ*।

(৫) আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাত ইবন মুসা আত তিরমিযীর (২০০-২৭৯ হি.) সংকলিত *জামি আত- তিরমিযী*।

(৬) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মাজাহ্‌ার (২০৯-২৭৩ হি.) সংকলিত *সুনান ইবন মাজাহ্*।

সোনালী যুগের এ সময়ে ফিকাহ তথা ইসলামী আইন শাস্ত্র প্রনয়নেও এ যুগের অবদান অবিস্মরণীয়। এ সময়কালে ইসলামী আইনের মহান ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু হানিফা (মৃ.৭৬৭ খ্রি.), ইমাম শাফেয়ী (মৃ. ৮১৯ খ্রি.), ইমাম মালেক (মৃ. ১৭৯ হিঃ), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ শায়বানী (মৃ. ৮০৫ খ্রি.), ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. ৭৯৮ খ্রি.), ইমাম আওযায়ীর মতো যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের হাত ধরে ইসলামী আইনশাস্ত্র একটি পরিণত স্তরে উপনীত হয়।

সুকুমার শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ

ইসলামী সোনালী যুগে জীবন ঘনিষ্ঠ সুকমার শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। এসময়ে শিল্প-সাহিত্যের চরম উন্নতি সাধিত হয়। সুন্দর ও উত্তম সাহিত্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। মহানবী (সা.) বলেছিলেন- " নিশ্চয় সুন্দর ও সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গিতে যাদু রয়েছে।"[৪৫] তাঁর এ বাণীকে ভিত্তি করে মুসলিম কবি সাহিত্যকরা উন্নতমানের নানা ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। আব্বাসী আমলের বিখ্যাত রম্য সাহিত্যিক ইবনুল মুকাফ্‌ফা (মৃ.৭২৭ খ্রি.) 'আলিফ ওয়া লাইলা' তথা হাজার এক রজনী নামক এক কালজয়ী লোককথার গল্প সংকলন ও অনুবাদ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এটি আরব্য রজনী নামেও পরিচিত। এর মূল নাম 'এক হাজার এবং এক রাত' তবে সহস্র এবং এক আরব্য রজনী বা এরবিয়ান নাইটস নামেও এটি পরিচিত। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হতে অনূদিত ' কালিলা ওয়া দিমনস্থ নামক আরেক অসাধারণ গল্প গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন ইবনুল মুকাফ্‌ফহ। হিতোপদেশমূলক একগুচ্ছ রোমাঞ্চকর গল্পের মাধ্যমে লেখক এতে একটি অনাস্বাদিত জগৎ ও ভিন্নমাত্রিক গদ্যশৈলী পাঠককে উপহার দিয়েছেন এ গ্রন্থে।[৪৬]

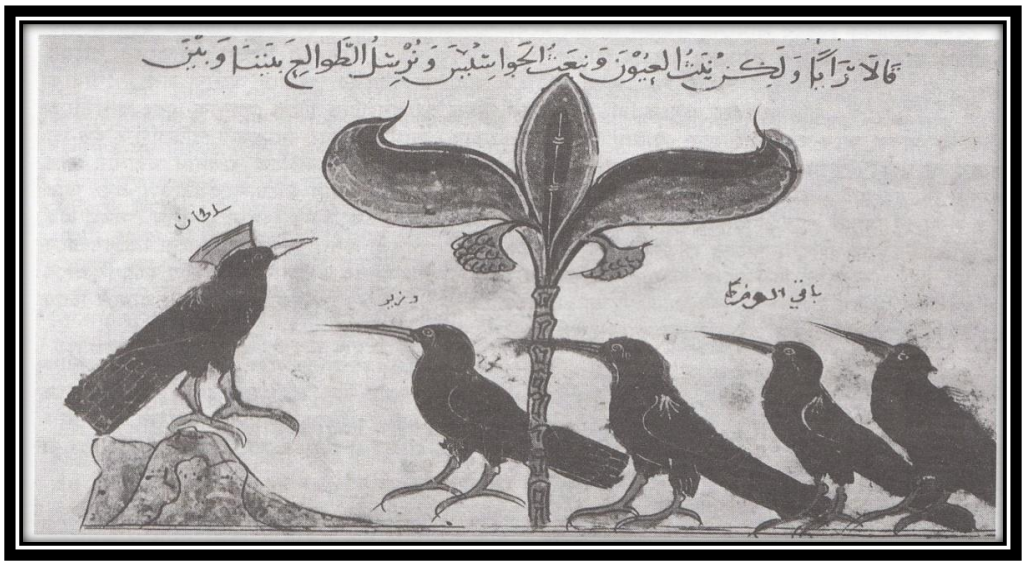

৪৭

[কালীলা ওয়া দিমনা-এর একটি কাহিনী চিত্র (১২০০-১২২০ খ্রি.)]

এভাবে আল জাহিজ (মৃ. ৮৬৮/৯ খ্রি.) রচনা করেছিলেন 'আল বয়ান ওয়াত তিবিয়ান' নামক বিশাল এক সাহিত্য সম্ভার। আরবী সাহিত্যের ময়দানে এক অনন্য গ্রন্থ। বয়ান-বক্তৃতা, অংলকার শাস্ত্র ও লেখনী-কৌশলসহ অসংখ্য বিষয় তিনি এ গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। ভাষা-বিজ্ঞানের অনেক বিষয়, যা নিয়ে আজ আধুনিক বিশ্বে নতুনভাবে গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছে, তা তিনি এই গ্রন্থে সুন্দর ও সাবলীলভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। *মকামাত-ই-হারিরী* এ সময়ের আরেক চমকপ্রদ কাহিনী সম্ভার। নানারূপ রসে ভরপুর এ গল্পগাঁথা এখনো পাঠক সমাজকে উজ্জীবিত করে। মাকামাতে হারীর মূল পাণ্ডুলিপি প্যারিস বিবলিওথেক ন্যাশনালে রক্ষিত আছে।[৪৮] এসময়ে লিখন শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয়। আব্বাসী শাসন আমলের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) দুজন জগদ্বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার 'আদ-দাহ্হাক ইবন আজলান ও ইসহাক ইবন হাম্মাদ' এর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁদের শিল্পসম্মত উপস্থাপনা এবং দক্ষ হস্তের ক্যালিগ্রাফির জন্য তাঁরা বিখ্যাত ছিলেন। দশম শতাব্দীর বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ছিলেন 'ইবন মুকালা' (মৃ. ৯৪০ খ্রি.)। তাঁকে সেই শতাব্দীর ক্যালিগ্রাফি শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলা হয়।[৪৯] ক্যালিগ্রাফি শিল্পে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে বলা যায়, "মৌমাছি যে প্রেরনায় চাকে কোষ নির্মাণ করে, তিনিও সে রকম ক্যালিগ্রাফি শিল্পে প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিলেন। ক্যালিগ্রাফির জনক ইবনে মুকলার হাতে পরিশীলিত এবং ইবনে বাওয়াব (মৃ. ১০২২ খ্রি.) ও ইয়াকুত আল মুস্তাসিমীর (মৃ. ১২৯৮ খ্রি.) হাতে শৈলিতে শীর্ষ মানে পৌঁছায়। এমন আরো অসংখ্য সুকুমার শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল যার পেছনে বায়তুল হিকমাহসহ অন্যান্য গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম। এভাবে স্বর্ণযুগে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি ও বিকাশের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন।

পশ্চিমা গবেষক অধ্যাপক জি সারটন স্বর্ণযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতিশ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, "এখানে মুষ্টিমেয় কিছু নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। সমসাময়িককালে পাশ্চাত্যের তাদের সমতুল্য কেউ ছিল না। তারা হলেন ঃ জাবির ইবনে হাইয়্যান, আল কিন্দি, আল খাওয়ারিজমি, আল ফরগানি, আল রাজি, ছাবেত ইবনে কোরা, আল বাত্তানি, হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল ফারাবি, ইব্রাহিম ইবনে সিনান, আল মাসুদি, আল তাবারি, আবুল ওয়াফা,

আলি ইবনে আব্বারস, আবুল কাসিম, ইবনে আল জাজারি, আল বেরুনি, ইবনে সিনা, ইবনে ইউনুস, আল কাশি, ইবনে আল হাইছাম, আলি ইবনে ঈসা আল গাজালি, আল জারকাব, অমর খৈয়াম। গৌরবোজ্জ্বল নামের তালিকা দীর্ঘ করা মোটেও কঠিন হবে না। যদি কেউ আপনার উচ্চারণ করে যে, মধ্যযুগ ছিল বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অনুরবর তাহলে তার কাঝে এসব নাম উল্লেখ করুন। তাদের সবাই ৭৫০ থেকে ১১০০ সাল পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন।[৫০]

বায়তুল হিকমাহর নির্মম পরিনতি

সোনালী যুগে মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এবং তা সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা ইসলামের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। এর মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে কালক্রমে গড়ে ওঠা মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার মুসলমানদের হাত ধরে ইসলামী সভ্যতা হিসেবে বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীকালে মুসলমানদের সোনালী দিনের উৎসারিত রসনির্যাস ইউরোপীয় রেনেসার মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতায় আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৫১] আব্বাসী যুগে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক বায়তুল হিকমাহ ইসলামী সোনালী যুগের এ উজ্জল বাতিঘর। কয়েক শতাব্দিকাল ধরে এ বাতিঘর আলো ছড়িয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে তুলে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানব সভ্যতার শত্রুদের হাতে এ আলোকোজ্জ্বল বাতিঘরটি ধ্বংস হয়ে যায়। খলীফা আল মামুনের উত্তরাধিকারি আল মুতাসিম (শাসনকাল ৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) ও তার পুত্র আল ওয়াসিকের সময়কাল পর্যন্ত বাইতুল হিকমাহ্ সগৌরবে জ্ঞানের আলো বিতরণের কাজ চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে খলীফা আল মুতাওয়াক্কিলের আমলে (শাসনকাল ৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)- এর অবনতি শুরু হয়। এগারো শতকে শুরু হওযা ক্রুসেড[৫২] বা খ্রিস্টানদের চাপিয়ে দেয়া ধর্মীয় যুদ্ধ গোটা মুসলিম বিশ্বসকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ইউরোপিয় শাসকেরা ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ে জেরুজালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নেয়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুরু করেন ক্রুসেডের এই যুদ্ধ। ইউরোপিয় শাসকদের শুরু করা সে যুদ্ধ নানা স্তরে চলতে থাকে প্রায় তেরশো শতাব্দীর শেষ অবদিকাল পর্যন্ত। তাদের চাপিয়ে দেয়া নির্মম সে যুদ্ধে হত্যা, নির্যাতন, দখলদারিত্ব, মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা, অমানবিক অত্যচারসহ নানাপ্রকার জুলম নির্যাতন এবং হাজার বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া এ যুদ্ধের সামাল দিতে গিয়ে মুসলিম সম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই অর্থাৎ ১৩ শতকের শতকের মাঝামাঝিতে ধুঁকতে থাকা মুসলিম বিশ্বের সামনে এসে দাঁড়ায় আরেক ত্রাস-মোঙ্গলদের আক্রমণ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মঙ্গোলদের এ আক্রমণই ছিলো ইসলামের সোনালী যুগের অবসানের মূল কারণ।[৫৩] ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁনের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় গড়ে উঠেছিলো শক্তিশালী মোঙ্গল সাম্রাজ্য। ১২৫৮ সালের ২৯ জানুয়ারী তারই বংশধর হালাকু খাঁনের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী ও তার মিত্র শক্তিদের সামনে তছনছ হয়ে যায় আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী সমৃদ্ধ নগরী বাগদাদ।[৫৪] বাগদাদে যখন তাতারীদের বর্বরোচিত ধ্বংসাভিযান শুরু হয়, তখন সর্বপ্রথমে তারা এই লাইব্রেরীগুলোকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত করে। পুড়িয়ে দেওযা হয় লাইব্রেরী, গবেষণা কেন্দ্র। লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় মসজিদ ও দৃষ্টিনন্দন সব ভবন। নিরক্ষর তাতারীরা যা কিছু পেয়েছে, নির্বিচারে দজলা নদীতে নিক্ষেপ করেছে। এত বই-পুস্তক নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে দজলা নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।[৫৫] এ ধ্বংসলীলায় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানটি বায়তুল হিকমাহ্।[৫৬]

উপসংহার

সভাত্যার বিকাশ সাধনে বায়তুল হিকমাহর অবদান অপরিসীম। মুসলিম সভ্যতায় সোনালীযুগ সৃষ্টির পেছনে 'বায়তুল হিকমাহ' মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এ গবেষণাগারটি একাধারে গ্রন্থ সংগ্রহ সংগ্রশালা, বিদ্যাঙ্গন, গবেষণা কেন্দ্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। জ্ঞান বিজ্ঞান সৃষ্টি, চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল তা নজিরবিহীন ও বিস্ময়কর। এই বায়তুল হিকমা পরবর্তিকালে ইউরোপে নবজাগরণ সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখে। কিন্তু অতীব মর্মান্তদ ও দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে, বাগদাদের পতনের সাথে সাথে বায়তুল হিকমাহকেও নিমর্মভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। এ ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে শুধু মুসলিম সভ্যতা নয়, পুরো মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্র জাতীয় জীবনে আবারো সোনালী অধ্যায় সৃষ্টির জন্য অতীব গুরুত্ব সহকারে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করা অতীব জরুরী।

---

১. করীম, মুহাম্মদ রেজা-ই- (২০০৮), *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ২১৮।
২. কাদের, ড. এম. আবদুল (২০১০), *মুসলিম কীর্তি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২২৯-২৩০।
৩. নজিরাবাদী, আকবর শাহ (২০০৮), *ইসলামের ইতিহাস*, অনুবাদ: আবদুল মতিন জালালাবাদী ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা:, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮।
৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (১৯৯৪), *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৫ খণ্ড, পৃ. ৬০৮।
৫. Hitti. P.K. (2002), *History of the Arabs,* New York: Palgrave Macmillan, p. 88.
৬. ইবন কাসীর, ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা, আলবিদাহ ওয়া আল-নিহায়হ, কায়রো: আল- মতবাআ আল সদিয়্যহ, তা. বি ., ৬ ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০২।
৭. *https://www.britannica.com/biography/al-Mamun#ref248584*
৮. Brentjes, Sonja; Robert G. Morrison (2010). "The Sciences in Islamic societies". *The New Cambridge History of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 569.
৯. Ahmed, Dr. Hasanuddin (2008) , *A Concise History of Islam,* New Dehli: Good Word Books, p. 228.
১০. De Lacy O`Leary (2002), *How Greek Science Passed to the Arabs,* New Delhi: Goodwards, P.155-164.
১১. Al-Khalili, Jim (2011), *The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance,* New York: Penguin Press, 67-78.
১২. De Lacy O`Leary, Ibid, P.155-164.
১৩. আমীন, ড. আহমদ (২০০২), *দুহাল ইসলাম*, অনুবাদ: আবু তাহের মিসবাহ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ৬।
১৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (১৯৯৪), *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৫ খণ্ড, পৃ. ৬০৮।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. খান, সাহাদত হোসেন (২০১২), *স্বর্ণ যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিস্কার*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, পৃ. ৩৫।
১৭. আনসারী, মুসা, *মুধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : চয়নিকা, পৃ. ৮৬।
১৮. Ahmed, Dr. Hasanuddin, *A Concise History of Islam,* Ibid, p.219.
১৯. Al-Khalili, Jim, *The New Cambridge History of Islam,* Ibid, p. 67-78
২০. Ahmed, Dr. Hasanuddin , *A Concise History of Islam,* Ibid, 212-13
২১. Sardar and M.W. Davies (1990), *Distorted Imagination*; London: Grey Seal Books, p. 96-7.
২২. আনসারী, মুসা, *মুধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।
২৪. আনসারী, মুসা, *মুধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।
২৫. আমীন, ড. আহমদ (২০০২), *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
[২৭]. প্রাগুক্ত, ১৯।
[২৮]. করীম, মুহাম্মদ রেজা-ই- *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।
[২৯]. আমীন, ড. আহমদ *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৪-২৫।
[৩০]. করীম, মুহাম্মদ রেজা-ই-, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
[৩১]. আখতার উজ জামান, *জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ১২।
[৩২]. করীম, মুহাম্মদ রেজা-ই-, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।
[৩৩]. খান, সাহাদত হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।
[৩৪]. করীম, মুহাম্মদ রেজা-ই-, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।
[৩৫]. উইকিপিডিয়া. বায়তুল হিকমাহ.কম
[৩৬]. খান, সাহাদত হোসেন, প্রাগুক্ত, ১৭৯।
[৩৭]. প্রাগুক্ত, ১৫১।
[৩৮]. আমীন, ড. আহমদ (২০০২), *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২-৩০৬।
[৩৯]. হিট্টি, পিলিপ কে (১৯৭০), *হিস্ট্রি অব দ্য আরবস*, লন্ডন: দ্য ম্যাকমিলান প্রেস লি. , পৃ. ২৪৩।
[৪০]. উইকিপিডিয়া. বায়তুল হিকমাহ
[৪১]. করীম, মুহাম্মদ রেজা-ই-, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।
[৪২]. *Collins Cobuild Advanced Learner`s English Dictionary*, Harper Collins Publisher, Glasgow, 2006 , pp. 985.
[৪৩]. Ahmed, Dr. Hasanuddin, A Concise History of Islam, Ibid, p. 119.
[৪৪]. Ibid.
[৪৫]. সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৫৭৬৭।
[৪৬]. Latham, J.D. (1989), "*Ibn al-Muqaffa' and Early 'Abbasid Prose.*" In *Abbasid Belles-Lettres.* Eds. Julia Ashtiany, et al. Cambridge: Cambridge University Press, p. 48-77.
[৪৭]. হোসেন, এ বি এম (২০০৪), *আরব চিত্রকলা*, খান ব্রার্দাস এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা : পৃ.৪৯।
[৪৮]. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭।
[৪৯]. Faruqui, Islmail Raji Al (1986) , *The Cultural Atlas of Islma,* New York : Macmilan, P. 357.
[৫০]. খান, সাহাদত হোসেন, ইসলামের স্বর্ণযুগে *মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।
[৫১]. Saliba, George (2007), *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*.MIT Press, xi.
[৫২]. সাধারণভাবে ইতিহাসে ক্রুসেড বলতে পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং কন্সটান্টিনোপল এর অধিকার নেয়ার জন্য ইউরোপের খ্রিষ্টানদের সম্মিলিকত শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১০৯৫-১২৯১ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার যে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করে সেগুলোকে বোঝায়। Crusade শব্দটি ফ্রান্স croisade ও স্পেনিস cruzada শব্দ হতে উৎপত্তিকৃত একটি আধুনিক ইংরেজি শব্দ। অক্সফোর্ড ডিকশোনারির ভাষ্যমতে এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছু পাওয়া বা অর্জন করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মূলত ক্রুসেড (Crusade) দ্বারা ধর্মীয় যুদ্ধ বোঝানো হয়। পোপ দ্বিতীয় আরবানের আবেদনক্রমে ইউরোপের খ্রিষ্টান রাজ্যসমূহ জোটবদ্ধ হয়ে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে ১০৯৬ সাল হতে ১২৯২ সাল পর্যন্ত যে সকল ধর্মীয় যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালনা করে ইতিহাসে তা ক্রসেড যুদ্ধ নামে পরিচিত। (সূত্র : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নবম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।)
[৫৩]. আলী, সৈয়দ আমীর (২০০৮), *আরব জাতির ইতিহাস*, অনুবাদ: শেখ রিয়াজউদ্দীন আহমদ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৮৬-২৮৭।
[৫৫]. প্রাগুক্ত।
[৫৬]. *Al-Khalili, Jim, Ibid, p.223.*